ব্রাত্যজনের রুদ্ধ সঙ্গীত ও শিল্পীর পরিচয়*

- মোঃ আনিসুর রহমান

রবীন্দ্রনাথ বাঙালিকে যা দিয়ে গিয়েছেন তার মধ্যে সঙ্গীতই তার শ্রেষ্ঠ উপহার একথা তিনে নিজেই বলে গিয়েছেন। আমরাও উত্তরোত্তর এর পরিচয় পাচ্ছি, বিশ্বকবির কবিতা আমরা আজকের যতোটা মনে করি তাঁর চেয়ে বেশি মনে করছি, গেয়েই যাচ্ছি তার গান। এ গান যেন পুরনো হচ্ছে না, এ গান যেন আমাদের শাশ্বত জীবনের এক অবিচ্ছেদ্য নিত্য সঙ্গী হয়েই আছে যে সঙ্গীকে আমরা উত্তরোত্তর আরো নিবিড় করেই জড়িয়ে ধরছি।

রবীন্দ্রনাথের এই উপহারটি আমরা যাদের মাধ্যমে সবচেয়ে স্নেহভরে, সবচেয়ে বেশি পেয়েছি অর্থাৎ এ গান যারা অবিরাম গেয়ে গেয়ে আমাদের অন্তরের গভীরে পৌঁছে দিয়েছেন এ গানের অপার সৌন্দর্যে আমাদের হৃদয় উদ্ভাসিত করেছেন, এ গান জনপ্রিয় করেছেন তাদের মধ্যে আজকে তিনজন শিল্পীর নাম সর্বাগ্রে মনে আসে - কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়, সুচিত্রা মিত্র ও দেবব্রত বিশ্বাস। এদের প্রথম দুইজন বিশ্বভারতীয়ই সৃষ্টি। দেবব্রত বিশ্বাস বিশ্বভারতীতে রবীন্দ্রসঙ্গীত শিক্ষা গ্রহন করেননি এবং বিশ্বভারতীর কোন কোন মহল যেন মনে হয় তার গায়কী অনুমোদন করতে দ্বিধাগ্রস্ত হয়েছেন। এই কালজয়ী শিল্পীর “ব্রাত্যজনের রুদ্ধ সঙ্গীত” পড়ে তার অনেক ভক্ত কেঁদেছেন। একথাও শুনেছি যে সুচিত্রা মিত্র বিশ্বভারতী মিউজিক বোর্ডের সদস্য হয়েও দেবব্রত বিশ্বাসের কিছু রেকর্ড reject করবার ব্যাপারে কিছু করতে না পেরে অশ্রুসিক্ত হয়েছেন। এটা আমার শোনা কথাই; যদিও সুচিত্রা মিত্রকে ব্যক্তিগতভাবে যেভাবে চিনেছি তাতে একথা সম্পূর্ণ বিশ্বাসযোগ্যই মনে হয়েছে। তবে সম্প্রতি কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে সরাসরি দেবব্রত বিশ্বাসের গান সম্পর্কে যে অভিমত শুনেছি তা রবীন্দ্র সঙ্গীত অনুরাগীদের জানানো ও তার তাৎপর্য আলোচনা করাই আমার এই ছোট্ট লেখাটির উদ্দেশ্য।

গত বছর অক্টোবর মাসে যখন কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায় ঢাকায় আসেন তখন রিজওয়ানা চৌধুরী বন্যার বাসায় নাসরিন শামস্ তার কাছে রবীন্দ্র সঙ্গীতের গায়কীর প্রশ্ন উত্থাপন

করেন এবং সেই প্রসঙ্গে দেবব্রত বিশ্বাসের গানের কথা ওঠে। সে ঘরে তখন বন্যা, নাসরিন, ইফফাত আরা দেওয়ান ও আমি উপস্থিত ছিলাম। আমার যেরকম মনে আছে, কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন যে, একবার দেবব্রত বিশ্বাসের কয়েকটি গান বিশ্বভারতী মিউজিক বোর্ডে অনুমোদনের জন্য আসলে তাদের মধ্যে একটি গান বোর্ড reject করে দেয়। কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায় সে সময় মিউজিক বোর্ডে ছিলেন না। কিন্তু কয়েকজন তার কাছে ওই গানটি শোনাতে নিয়ে আসে গানটি সম্বন্ধে তার অভিমত শোনাবার জন্য। কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায় গানটি শুনে বলেছিলেন, ”আমি জানি না সুর একটু এদিক ওদিক হয়েছে কিনা, কিন্তু এরকম অসাধারণ রস দিয়ে জর্জ দা গানটি গেয়েছেন এ গান কি কেউ reject করতে পারে? তোমরা ওদের বলে দিও আমার এই কথা” ।

তারপরেও কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায় বলে যান “জর্জদা”র কথা। “এতো হাজার হাজার লোককে তিনি রবীন্দ্রসঙ্গীত শুনিয়ে মুগ্ধ করেছেন, কি রস তার গানে, এইটাই তো বড়ো কথা, স্বরলিপির সুর তো একটা কাঠামো মাত্র, একটা কঙ্কাল, তাতে রক্ত মাংস দিয়ে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করবার দায়িত্ব তো শিল্পীর হাতে।”

হাজার হাজার রবীন্দ্রসঙ্গীত অনুরাগীকে অভিভুত করেছেন এরকম এক কালজয়ী শিল্পী দেবব্রত বিশ্বাস সম্বন্ধে আর একজন কালজয়ী শিল্পীর এই অভিমত একাধিক কারনে বিশেষ তাৎপর্যময়। কালজয়ী হলেও যেকোন শিল্পীর গান যে সবার ভালো লাগতে হবে এমন কোন কথা নেই। এখানে ব্যক্তিগত রুচির ব্যাপার রয়েছে, যে কারণে কারো সুচিত্রা মিত্রের গান বেশি ভালো লাগে, কারো কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। কিন্তু একজন বড়ো শিল্পী আর একজন বড়ো শিল্পীকে সব সময় সম্মান করে এটি শিল্পী মনেরই একটি পরিচয়। কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায় অকুণ্ঠচিত্তে দেবব্রত বিশ্বাসের প্রতি তার শ্রদ্ধা জানিয়ে তার যথার্থ শিল্পী মনের যে পরিচয় দেন তা থেকে সব শিল্পীরই বিশেষ শিক্ষা নেবার রয়েছে।

কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই বড়ো মন আরো তাৎপর্যময় এই জন্য যে, তারই শিক্ষক প্রখ্যাত শৈলজারঞ্জন মজুমদার যে দেবব্রত বিশ্বাসের গান তেমন পছন্দ করতেন না এটা

মোটামুটি জানা কথা, তিনি বিভিন্ন স্থানে বাংলাদেশ সফরকালেও তার এই অভিমত ব্যক্ত করেছেন। শৈলজারঞ্জন মজুমদার রবীন্দ্র সঙ্গীতের গায়কীকে একটি বিশেষ “ঘরানার” পর্যায়ে দাবি করতেন যে দাবি নিয়ে শান্তিনিকেতনই শান্তিদেব ঘোষের সঙ্গে তার দ্বিমত ছিল।

শৈলজারঞ্জন মুখোপাধ্যায় একটি বিশেষ “ঘরানার” গায়কী লালন করে সেই গায়কীকে তার শিখরে তুলে অত্যন্ত সফল শিক্ষক হয়েছিলেন। কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায় এই “ঘরানার” শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি হয়েও এ ধরনের ‘ঘরনার’ চিন্তার সংকীর্ণতার ওপরে ওঠে তার থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন গায়কীর মধ্যে অসাধারণ রস দেখে তাকে এমন ভাবে শ্রদ্ধা জানিয়ে defend করেছেন এটি সব শিল্পীর জন্য একটি বড়ো শিক্ষার বিষয়।

বাংলাদেশেও হাজার হাজার রবীন্দ্রসঙ্গীত অনুরাগী “ব্রাত্যজনের রুদ্ধ সঙ্গীত” শুনে অভিভূত। এই সেদিন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ বিজ্ঞানের এক ছাত্রী আমাকে বলে যে, দেবব্রত বিশ্বাসের “নয়ন ছেড়ে গেলে চলে” গানটি শুনে সে স্তব্ধ হয়ে গেছে, তার শরীরে এক অনির্বচনীয় শিহরণ এসে তাকে কোথায় যেন নিয়ে গেছে। আমি অবাক হয়ে তার কথা শুনে যাই নতুন এই প্রজন্মের কাছে রবীন্দ্রসঙ্গীতের গভীরতাকে কে পৌঁছে দিচ্ছে? অনেকে হয়তো এই গভীরতার স্পর্শ পান না, অনেকের ব্যক্তিগত রুচি ভিন্ন। বাংলাদেশেও শৈলজারঞ্জনের অনুগত, তার “ঘরানা” তত্ত্বে প্রভাবিত শিক্ষক রয়েছেন যাদের মুখে দেবব্রত বিশ্বাস সম্বন্ধে অত্যন্ত অশ্রদ্ধাপূর্ণ মন্তব্য শোনা যায় (যেমন ১৯৯২ সালে সিলেটে রবীন্দ্র সঙ্গীত সম্মিলন পরিষদ আয়োজিত রবীন্দ্রসঙ্গীতের ওপর সেমিনারে)। একরম মন্তব্য দিয়ে কোন বড়ো শিল্পীর জন্য কোন দ্বার রুদ্ধ করা যেতে পারে, কিন্তু তাকে যে ছোট করা যায় না, বরঞ্চ নিজেকে ক্ষুদ্র বলে পরিচয় দেয়া হয় একথা শিল্পী ও তাদের শিক্ষকদের সবারই মনে রাখা প্রয়োজন। দেবব্রত বিশ্বাস সম্বন্ধে কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরম শ্রদ্ধাপূর্ণ মন্তব্য শুধু দেবব্রত বিশ্বাসকেই বড়ো বলে ঘোষনা করেনি, কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়কেও সত্যিই খুব বড়ো শিল্পী বলে প্রমাণ করেছে, তার এই মন্তব্যের এটিই সবচেয়ে বড়ো তাৎপর্য।

২৫শে বৈশাখ রবীন্দ্রনাথকে বিশেষভাবে স্মরণ করবার দিন। রবীন্দ্রনাথ সবরকম মনের সংকীর্ণতা, হিংসার উর্ধ্বে উঠতে আজীবন বাঙালিকে ও সমস্ত বিশ্ববাসীকেই আহ্বান করে গেছেন। সঙ্গীত জগতে হিংসা, ক্ষমতার রাজনীতি এগুলো যেন একটু বেশিই দেখা যায়। রবীন্দ্রসঙ্গীত জগতও এর ব্যতিক্রম নয়। রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পীরা ও শিক্ষকরা নিজেদের রুচি অনুযায়ী গান করুন ও শিক্ষা দিন, যে কোন "ঘরানা"য় অথবা অন্য প্রাঙ্গণে বিচরণ করুন, কিন্তু অন্য নিবেদিত ও সফল শিল্পীকে যথার্থ সম্মান দেখাবার মানসিকতা ও শিক্ষা যে কোন শিল্প-শিক্ষার একটি মৌলিক উপাদান হওয়া একান্ত প্রয়োজন। এবং এ ব্যাপারে শিক্ষকদের দায়িত্বই সবচেয়ে বেশি। তাহলেই কেবল সঙ্গীত জগতের পরিবেশ সুস্থ হয়ে উঠতে পারে এবং রবীন্দ্রনাথ তৃপ্ত হতে পারেন এই জেনে যে, বাঙালি তার শ্রেষ্ঠ উপহারকে সংকীর্ণ স্বার্থে কর্দমাক্ত করেনি।

**সংবাদ সাময়িকি*, ৪ মে ১৯৯৫